সিরাতু আসমা'ইন নবী

২য় দারস

عربي – আরাবী

খাঁটি আরব বলতে বুঝানো হয় কাহতানকে, এদেরকে আরবজাতির জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আবার অনেকেই বলেন, এই অংশের জনক ইয়ারুব। আর সেখান থেকেই 'আরব' শব্দটি এসেছে। আরব কারা? ইয়া'রুবের সন্তানরাই আরব। কাহতানের পুত্র ইয়ারুবই সর্বপ্রথম আরবি ভাষার প্রবর্তন করেন। ফলে ইয়া'রুব যে ভাষায় কথা বলতো সেটা আরবী আর যারা ইয়া'রুবের ভাষায় কথা বলতো তারাই আরব।

এই ইয়া'রুব কাহতানের সন্তান ছিল বিধায় তাদেরকে কাহতানী আরবও বলে হয়।

এই আরবদের সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিলো আরবের দক্ষিণাঞ্চলে, উদাহরনস্বরূপ ইয়েমেনী সভ্যতার কথা বলা যেতে পারে। কাহত্বানের যুগ সম্পর্কে আমরা নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা বলতে পারবোনা, তবে হতে পারে ঈসা (আ) এর জন্মের কয়েক শতাব্দিকাল আগে তিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেছিলেন। কারণ কাহত্বান আদনানের অনেক আগের ব্যক্তি ছিলেন। এটা আমরা কিভাবে জানতে পারি? কারণ ইসমাঈল (আ) বিয়ে করেছিলেন জুরুহুম গোত্রে, যা কাহত্বানের একটি শাখাগোত্র। তাই কাহত্বান নিঃসন্দেহেই আদনানের অনেক আগেই আরবের বাসিন্দা ছিলো।

সবচেয়ে বিস্তৃত আরব হলো আদনানী আরব, এই আদনানী আরব হলো ইসমাঈল (আ) এর বংশধর। উনার বংশে ঠিক কত বংশানুক্রম পরে আদনান এসেছে তা আল্লাহই ভালো বলতে পারেন, তবে আদনান হলো ইসমাঈল (আ) এর বংশীয় প্রজন্ম। এই আদনান যিনি ইবরাহিমের পুত্র ইসমাঈলের বংশধর, সেই ইব্রাহিম (আ) কোথায় বসবাস করতেন? আরব ভূখন্ডে? না, তিনি বাস করতেন ইরাক ও শামে। ইরাক এবং শাম যা বর্তমান ফিলিস্তিনকেও অন্তর্ভূক্ত করে। ইব্রাহিম সেইখান থেকেই এসেছিলেন। এ কারণেই ঐতিহাসিকগণ বলেন, আদনানী আরবরা মূলত অভিবাসী আরব অর্থাৎ আল আরাবুল মুস্তা'রিবাহ। যারা আরবী ভাষাকে নিজেদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, কেননা ইবরাহিম (আ) এর মৌলিক ভাষা আরবী ছিলোনা।

যখন ইসমাঈল (আ) এর বংশধর আরব উপদ্বীপে বসবাস করতে শুরু করলো, তাদেরকে আস্তে আস্তে আরবী ভাষা ও সংস্কৃতি আয়ত্ত করে নিতে হয়েছিলো। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা বলছেন তারা খুব ভালোভাবেই সেই ভাষা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলো। কোনো সভ্যতাকে গ্রহণ করতে হলে এর ভাষাকে আয়ত্ত করে নেয়ার কোনও বিকল্প নেই।

এই আদনানই আমাদের রাসূল (সা) এর সরাসরি পূর্বপুরুষ। তাই রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন আদনানী আরব, কাহত্বানী আরব না। কারণ আদনানই হচ্ছে ইসমাঈল (আ) এর উত্তরপুরুষ। আমাদের রাসূল (সা) ছিলেন আদনানের ২০ তম উত্তরপুরুষ। এক কথায় মুহাম্মদ (স) ও আদনানের মাঝে ২০ টি প্রজন্ম অতিবাহিত হয়েছে। আদনানের বংশক্রম নিচের দিকে আসতে আসতে একসময় এসেছে মুদর, এবং তাঁর ভাই রবীআহ। এই দুজন হলেন একেবারে সরাসরি আদনানের মূল পরম্পরার উত্তরপুরুষ।

এভাবেই রাসূলুল্লাহ (স) এর পূর্বপুরুষের পটভূমি আমরা মোট তিনটি চেইনে বিভক্ত করতে পারি। প্রথম চেইন রাসূলুল্লাহ থেকে আদনান পর্যন্ত সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। এই চেইনে কোনো দ্বিধা বা প্রশ্ন নেই। এ যেন পাথর খোদাই করা সর্বজনগৃহীত পরম্পরা। এ পরম্পরায় মোট ২০ টি প্রজন্ম রয়েছে। এ পরম্পরাসূত্র একেবারেই মৌখিকভাবে সংরক্ষিত এবং ঐতিহাসিক ভাবে স্বীকৃত। দ্বিতীয় চেইন আদনান থেকে ইব্রাহীম (আঃ) পর্যন্ত। তৃতীয় চেইন ইব্রাহীম (আঃ) থেকে আদম (আঃ) পর্যন্ত।

قرشي – কুরাইশী

আমাদের প্রিয় নবী হলেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসা'ঈ ইবনে কি'লাব ইবনে মুর'রাহ ইবনে কা'আব ইবনে লু'আহ ইবনে গালিব ইবনে ফিহর ইবনে মালিক ইবনে আন-নাদর ইবনে কিনানাহ ইবনে খুজাইমাহ ইবনে মুদরিকাহ ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুদার ইবনে নিজার ইবনে মাদ ইবনে আদনান।

সহীহ মুসলিমের হাদিস, এই হাদিসটিতে লক্ষ্য করলে আমরা তাঁর উর্ধতন এই পুরুষদের ব্যাপারে সামগ্রিক ধারণা লাভ করতে পারি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলছেন- আল্লাহ্ ইসমাঈল (আ) এর বংশধর থেকে কিনানাহকে বেঁছে নিলেন, এরপর কিনানাহ'র বংশধর থেকে কুরাইশকে বেঁছে নিলেন, অতঃপর কুরাইশদের থেকে বনু হাশেমকে বেঁছে নিলেন । সবশেষে বনু হাশেম থেকে আমাকে নির্বাচিত করলেন।

যখন জাফর ইবনে আবি তালেবকে নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলো তখন তিনি বলেছিলেন- আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে আমাদের

কাছে প্রেরন করেছেন, (আরাফনা নাসাবাহু) যার বংশ পরিচয় সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ন ওয়াকেবহাল।

এছাড়া মুগীরা ইবনে শু'বাহ (রা) পারস্যের শেষ সম্রাট ইয়াযদাজারের সামনে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন- আল্লাহ্ আমাদের কাছে রাসূল হিসেবে একেবারেই সুপরিচিত ব্যক্তিকেই পাঠিয়েছেন, যার বংশধারা আমাদের জানা, যার সামাজিক অবস্থান আমাদের কাছে পরিস্কার, যার জন্ম পরিচয় সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁর জন্মভূমি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান, তাঁর গ্রহনযোগ্যতা সার্বজনীন, তাঁর পরিবার আমাদের মাঝে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন পরিবার, তাঁর গোত্র আমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম গোত্র, তিনি নিজেও ছিলেন আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- আল আইম্মাতু মিন কুরাইশ। আমার উম্মতের নেতৃবর্গ সবসময় কুরাইশ থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এটি হাদীসের নির্দেশনা। তাই দেখবেন উম্মতের রাজনৈতিক ইতিহাসে কুরাইশ থেকেই নেতা নির্বাচিত হয়েছে। যেমন খুলাফা রাশেদুন, আব্বাসী খেলাফত, উমাইয়া খেলাফত থেকে শুরু করে এক হাজারেরও অধিক বছর ধরেই উম্মত কুরাইশ থেকেই নেতা নির্বাচন করেছেন। সুন্নী জনগোষ্ঠীর কাছে এটাই বাস্তবতা।

সম্ভাব্য তিনজন ব্যক্তি আছেন যাদেরকে কুরাইশ সম্বোধন করা হতো। ঐতিহাসিকরা বলেন, ঐ তিনজনকে ডাকা হতো বড় কুরাইশ, মেজো কুরাইশ আর ছোট কুরাইশ। তিনজন হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে দুইজন ছিলো যাদের ব্যাপারে এই নাম খাপ খায়। একজন হলো ফেহের, আরেকজন হলো আন-নদর। সর্বশেষ হলেন কুসই।

এখানে একটা চমকপ্রদ তথ্য বলে রাখি, যে ১০ জন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী রয়েছেন তারা সকলেই কিন্তু কুরাইশী। এই আশারা মুবাশশারা

প্রত্যেকের বংশক্রম উপরের দিকে উঠলে সবার ধারা মিলিত হয় ফিহরের কাছে গিয়ে। এ থেকে বুঝা যায় যে ফিহরই আসল কুরাইশ। আর রাসুলুল্লাহর সময়ে কুরাইশের ১২/১৩ টি গোত্র ছিলো, যেমন বনু হাশেম, বনু যুহরা, বনু মাখযুম, বনু উমাইয়া, বনু আবদে শামস ইত্যাদি... এদের বংশক্রমের মিলনস্থলও ফিহর।

এই যে কুরাইশ উপাধি, এই কুরাইশ শব্দের অর্থ কী?

এক্ষেত্রেও বেশ কিছু মতামত আছে। এর একটি হলো, কুরাইশ অর্থ বাণিজ্য করা। কেননা কুরাইশ ব্যবসা করতো। আরেকটি মত হচ্ছে, ক্বারাশা ইয়াক্বরিশু অর্থ জমায়েত করা। কেননা কুরাইশের গোত্রগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, পরে তাদের এক পূর্বপুরুষ তাদেরকে বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে মক্কায় একত্রিত করে। তৃতীয় মতটি তবরীতে বর্ণীত হয়েছে, কুরাইশ অর্থ বিজয়ী হওয়া, এর পিছনেও দীর্ঘ ইতিহাস আছে, একটি গোত্র ছিলো যেটি অন্যান্য গোত্রের উপর যুদ্ধ পরিচালনা করতো, সেখান থেকেই কুরাইশ নামটি এসেছে। মূলত এটি হচ্ছে ফিহরের উপাধি যা তাঁর বংশধরেরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম বহন করেছে। এভাবেই সমস্ত কুরাইশ গোত্রগুলো ১২ পুরুষ উর্ধে ফিহরের সাথে মিলিত হয় যিনি রাসূলুল্লাহর পূর্বপুরুষ।

কুসই ছিলেন কুরাইশদের তারকা, তাই তাঁকে ডাকা হতো ছোট কুরাইশ বলে। তিনিই সর্বপ্রথম বলতে গেলে কুরাইশকে উন্নতির শিখরে নিতে শুরু করেন। উনার পাঁচ পুরুষ পরেই যখন রাসূল (সা) দুনিয়ায় আসছেন তখন কুরাইশ ইতিমধ্যেই উন্নয়ন অগ্রগতি ও ক্ষমতার শীর্ষচূড়ায় আরোহন করেছে। কুসই এর হাত ধরে শুরু হওয়া সেই অগ্রগতি পাঁচ প্রজন্ম পরেই রাসূলুল্লাহর সময়ে কুরাইশকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নিয়ে যায়।

কুসই প্রায় ৪০০ খৃষ্টাব্দে বসবাস করেছিলেন, রাসূলুল্লাহর জন্মের প্রায় ১৭০ বছর পূর্বে। তিনি কি করেছিলেন? তাঁর অসংখ্য অবদান আছে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব ছিল– তিনি মক্কার হারানো রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে তা আবার কুরাইশ বংশের সন্তানদের হাতে এনে দিয়েছিলেন।

এখান থেকেই মূলত "কুরাইশ" বা "একত্রিত করা" নামটি এসেছে। খুযা'আহ গোত্রের বিরুদ্ধে কুসই ফিহরের সমস্ত গোত্রকে আহ্বান করল ও তাদেরকে একত্রিত করে মক্কা থেকে খুযা'আ গোত্রকে বহিস্কার করে বিজয় অর্জন করলো। এভাবেই রাসূলুল্লাহর (স) ষষ্ঠতম উর্ধতন পুরুষ কুসই কুরাইশকে আবারো মক্কায় পুনপ্রতিষ্ঠা করলো।

এছাড়া কুসাই মক্কাতে দারুন নাদওয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এটা ছিলো আরবদের সংসদ ভবন। উনিই প্রথম এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন যে প্রত্যেকেই সংসদে আসবে এবং নিজ নিজ মত প্রকাশ করবে। তিনি সর্বপ্রথম কা'বার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্ব ও পদ সৃষ্টি করেন, এবং কা'বা সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু সম্মানজনক দায়িত্ব তাঁর মাধ্যমেই পরে বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হতে থাকে। যেমন, হাজিদের পানি পান করানো, হাজীদের মেহমানদারি করা, কা'বার চাবি বহনের দায়িত্ব।

তিনি হাজীদের জন্য আথিতেয়তার সংস্কৃতি গড়ে তুলেন। তিনি কুরাইশকে লক্ষ্য করে বলেন– ও কুরাইশ, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর নিয়ামতের জন্য নির্বাচন করেছেন, তাঁর ঘর ও ঘরের মেহমানদের যত্ন নেয়ার মত গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন। যারা এই ঘরের উদ্দেশ্যে আসবে তারাই এই ঘরের মেহমান, তারা আমাদের আথিতেয়তা পাওয়ার অধিকার রাখে। ফলে তারা হাজীদের মেহমানদারির জন্য খাদ্য, পানীয় ও অর্থ তহবিল গঠন করতো এবং তা হাজীদের জন্য খরচ করতো।

এছাড়া তিনি হাজীদের জন্য মুযদালিফায় আগুনের ব্যবস্থা করেছিলেন। বড়ো আগুনের কুন্ডলি থেকে হাজীরা নিজ নিজ তাবুতে আগুন নিয়ে যেতো আলোর উৎস হিসেবে। হাজীদের জন্য তিনি কুপ খনন করেছিলেন। এই কূপের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিলো কারণ তখন জমজম ছিলোনা।

কুসাই মক্কার উপকেন্দ্রে সর্বপ্রথম "হুজুন" নামক কবরস্থান গড়ে তোলেন। ওই কবরস্থানে সর্বপ্রথম তাকেই শায়িত করা হয়। কবরস্থানটি এখনো বিখ্যাত হয়ে আছে।

هاشمي - হাশেমী

তাঁর সন্তান আবদে মানাফ যার প্রকৃত নাম ছিলো মুগীরা, মানাফ অর্থ সমুন্নত। নামটি তারা আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত করেছিলো। এই আবদে মানাফ ছিলেন সুদর্শন ও নেতাগোছের ব্যক্তিত্ব। তিনি এমনকি তাঁর পিতা কুসাইয়ের সময়কালেও তাঁর নেতৃত্বের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বগুণের কারনে তাঁকে অনেক দায়িত্বও দেয়া হয়েছিলো। তিনি মক্কাবাসীর কাছে অত্যন্ত প্রিয়মুখ ছিলেন।

তারই সন্তান হাশেম, যার মাধ্যমে বনু হাশেম গোত্রের আবির্ভাব হয়। হাশেম ছিলো তাঁর উপাধি, তাঁর আসল নাম ছিলো আমর। হাশেম অর্থ চূর্ণ করা। তিনি যব চূর্ণ করে তা দিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করে হাজীদের আপ্যায়ণ করতেন তাই তাঁকে হাশেম ডাকা হতো। বলা হয় হাশেম কখনো একাকী খাবার খেতেন না। খাবার সময়ে তিনি কাউকে না কাউকে ডেকে তাঁর সাথে বসাতেন। তাঁর বদান্যতার কথা লোকমুখে ছড়িয়ে পরেছিলো। কুরাইশের

অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে এবং জীবিকাকে অন্যন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার পেছনে হাশেমের ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিলো। তাঁর দাদা কুসাই কুরাইশের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মক্কার নেতৃত্ব অর্জন করার মাধ্যমে, আর হাশেম কুরাইশের অর্থনৈতিক ভাবমুর্তিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম রিহলাতাশ শিতা ওয়াস সঈফ চালু করেন। গ্রীষ্ম ও শীতকালীন বানিজ্যের চিন্তা প্রথম তিনিই বাস্তবায়ন করেন।

এভাবেই তিনি নতুন করে ব্যবসার কেন্দ্র গড়ে তুললেন, উপরে রোম, নিচে ইয়েমেন আর মাঝখানের কেন্দ্রে মক্কা। বানীজ্যের নতুন পথ উন্মোচিত হলো, আর হাশেম ধনকুবের হয়ে উঠলেন। এ কারণেই তিনি কাফেলার পর কাফেলা হাজীদের আপ্যায়ণ করতে পারতেন, এ জন্যেই তাঁর নাম হাশেম হয়। আল্লাহ্ কুরাইশকে সম্বোধন করে ঠিক এই অনুগ্রহের কথাটিই স্মরণ করিয়ে দিয়ে পূর্ণ একটি সূরা নাযিল করলেন– লি ঈলাফি কুরাইশ, ঈলাফিহিম... আমিই তোমাদেরকে স্বাবলম্বী করেছি, সমৃদ্ধি দিয়েছি, ফলে তোমাদের আর অনাহার থাকতে হয়নি, খাদ্য নিয়ে পেরেশান থাকতে হয়নি। আমিই তোমাদেরকে কা'বা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছি। হাশেম এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন যে, যেহেতু তারা কুরাইশ, এবং কা'বার উপকন্ঠে তারা বসবাস করছে তাই তাদেরকে আক্রমণ করার মত দুঃসাহস কারো হবেনা। একটি সংবিধানহীন সমাজে তিনি এটুকু প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন যে কুরাইশের কাফেলায় কিংবা গ্রামে কেউ আক্রমণ করতে চাইবেনা, এমনকি মুশরিকরাও কিছু হলেও অপরাধবোধ করবে এই কাজ করতে কারণ প্রত্যেকেই মনে করতো কুরাইশ যেহেতু কা'বার হেফাজতকারী তাই তারা অন্যদের তুলনায় কিছুট হলেও পবিত্র ও আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত।

হাশেমের এক স্ত্রী যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর উর্ধতন দাদী তিনি ছিলেন ইয়াসরিবের নারী। এটা ছিল নিঃসন্দেহে আল্লাহর মহা পরিকল্পনার অংশ, তা না হলে কেনো মক্কার এক লোক হাশেম সুদূর মদীনার এক নারিকে বিয়ে করবেন?! এ কারণেই তিন প্রজন্ম ধরে মদীনায় রাসূলুল্লাহর বংশীয় চাচাতো ভাইয়েরা ছিলেন। মদীনার আনসারীদের মধ্যে যেমন আবু আয়ুব আনসারী (রা) ছিলেন তাঁর বংশীয় দাদীর পক্ষ থেকে আত্মীয়। হাশেম মদীনা থেকে বিয়ে করেছিলেন এবং তিনি গাজা অভিমুখে বাণিজ্য সফরে ইন্তেকাল করেন। আর সেখানে এখনো পর্যন্ত একটি মাসজিদ আছে যার নাম মাসজিদ সায়্যিদে হাশেম। এমনকি গাজাকে কালেভদ্রে গাজ্জাতু হাশেম ডাকা হয়। আজকের এই বিখ্যাত গাজা সেখানেই হাশিমের কবর হয়। এখনো গাজাকে হাশেমের গাজা ডাকা হয়।

তো, হাশেম মক্কা থেকে অনেক অনেক দূরে মারা গেলেন। তাঁর সবচেয়ে যোগ্য সন্তানকে নিয়ে হাশেমের স্ত্রী তাঁর মাতৃভূমি মদীনায় চলে গেলেন। এভাবেই রাসূলুল্লাহর দাদা ভবিষ্যতের ইসলামের দ্বিতীয় গুরুত্বপুর্ন শহর মদীনায় বেড়ে উঠতে লাগলেন। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর প্রজ্ঞাপুর্ণ লিপিবদ্ধ তাকদীর, এভাবেই মক্কা এবং মদীনার মধ্যে একটি মজবুত সম্পর্ক তৈরি হলো, ইতিপূর্বে যা ছিলোনা। রাসূলুল্লাহর এই দাদার নাম ছিলো শায়বাতাল হামদ, আব্দুল মুত্তলিব তাঁর প্রকৃত নাম নয়। শায়বা অর্থ হলো বয়স্ক লোকদের চুলে যে পাক ধরে তা। আমারও এখন শায়বা দেখা দিচ্ছে, মা শা আল্লাহ্। বার্ধক্যের সফেদ চুলকে শায়বা বলে। কিছু শিশু এই সাদাটে চুল নিয়েই জন্ম গ্রহণ করে। শায়বারও এই রকমের চুল ছিলো তাই তাঁকে শায়বাতাল হামদ ডাকা হতো। পিতার মৃত্যুর পর তিনি মদীনায় লালিত পালিত হন। তবে ঘটনা হলো, হাশেমের স্ত্রী হাশেমের ভাইদেরকে বলেননি যে

তিনি অন্তস্বত্বা ছিলেন, তিনি এ বিশয়টি গোপন করেছিলেন কারণ তারা এটা জানলে তাঁকে সন্তান তাদের কাছে জন্ম দেয়ার জন্য বাধ্য করতেন এবং সন্তানকে নিয়ে নিতেন। তাই তিনি এটা না জানিয়ে মদীনায় চলে যান। এবং সেখানেই শায়বার জন্ম হয়। তিনি এভাবেই খুশি ছিলেন, কারণ তখনকার দিনে পিতৃহীন সন্তান বংশের ক্ষমতাশালীদের কাছেই দিয়ে দেয়ার রেওয়াজ ছিল, আর এ ক্ষেত্রে কুরাইশ শক্তিশালী ছিলো বলে বিষয়টি তিনি গোপন রাখেন সন্তানকে নিজের কাছে রাখার জন্য। একদিন শায়বার চাচা মুত্তলিব ইয়াসরিবে বেড়াতে গিয়ে শায়বাকে দেখতে পেয়ে বললেন– এর মধ্যে আমার বংশের রক্ত বইছে। তখনকার দিনে এমনকি এখনও মানুষ কাউকে দেখলেই বুঝতে পারে। এ ইয়াসরিবের না, এ অমুক জায়গার না, এ তো কুরাইশী। তখন লোকেরা বিষয়টি নিয়ে খোঁজ খবর করে দেখতে পেলেন আসলেই এই ছেলে তাঁর ভাইয়ের ইয়াসরিবী স্ত্রীর সন্তান। তিনি নিশ্চিত হলেন এ তাঁর ভাতিজা। ফলে তিনি একটি ঘটনা সাজালেন যা দীর্ঘ কাহিনী এরপর তিনি শায়বাকে দত্তক নিয়ে চলে আসলেন। অন্যথায় তাঁর আত্মীয় স্বজনরা রাজী হচ্ছিলো না। তিনি শায়বাকে এই বলে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আসলেন যে, তুমি আমাদের ঐতিহ্যবাহী কুরাইশ বংশের সন্তান, তোমার বংশ এতো এতো সম্পদশালী, মর্যাদাবান, তোমার তো নিজের সম্মানকে ফিরিয়ে আনা উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকের মতে তাঁর মা এতে রাজী ছিলেন, কেউ কেউ বলে– না, তাঁর মা তাঁর এই প্রস্থানে রাজী ছিলেন না। মুত্তলিব এবার শায়বাকে নিয়ে উটে চড়ে ফিরতি পথ ধরলেন। যখন মক্কাবাসীরা দেখলো মুত্তলিব এক নতুন যুবককে নিয়ে আসছে তখন তারা মনে করে নিলো যে এইটা মুত্তলিবের নতুন ক্রয়কৃত দাস। তাই তারা বলতে লাগলো– ওহ, এটা তো মুত্তলিবের কেনা গোলাম, এটা আব্দুল মুত্তলিব। আসলে মুত্তলিব ছিল তাঁর চাচা। কিন্তু লোকমুখে প্রচলিত হয়ে যাওয়া এই নামটিই তাঁর স্থায়ী হয়ে গেলো।

পরে আব্দুল মুত্তলিবকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় তাঁর চাচা এবং চাচাত ভাইদের সাথে কারণ তাঁর বাবা মারা গিয়েছিলেন। তাঁর দাদার সম্পত্তির সিংহভাগই তাঁর চাচারা নিয়ে ফেলেছিলো, পরে তিনি আপন চাচদের মাধ্যমে নিজের সম্পত্তিতে নিজের অধিকার প্রমাণ করে তা আদায় করে নেন। এভাবেই নিজের স্থান ও কর্তৃত্ব তিনি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা করে নেন।

পরিশেষে, রাসূলুল্লাহর বংশধারার এই বর্ণনা আমাদের সামনে প্রকাশ করে তাঁর পূর্বপুরুষদের প্রত্যেকের জীবনে তাৎপর্য্যপূর্ন কিছু ঘটতে চলছিলো, এবং প্রত্যেক পূর্বপুরুষ তাদের আয়ুস্কালে ঐতিহাসিক কিছু ভূমিকা রেখেছিলেন। রেখে গিয়েছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ কিছু স্মরণীয় অবদান। কখনো রাজনৈতিক সাফল্য, কখনো অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কখনওবা জমজম আবিষ্কার। এখন আমরা যখন এসব অধ্যয়ন করি তখন বুঝতে পারি কেনো আল্লাহ্ মুহাম্মদ (স) কে নির্বাচিত করলেন, কেনো তাকে পাঠানোর জন্যে তাঁর বংশকে বাছাই করলেন, এই কারণে যে এর চেয়ে সমৃদ্ধ ও উত্তম বংশধারা আর হতে পারেনা। এজন্য হুনাইনের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স) উচ্চারণ করেছিলেন– আনান নাবিয়্যু লা কাযিব, আনা ইবনু আবদিল মুত্তলিব। আমিই নবী এতে কোনো সন্দেহ নেই, আমি আবদুল মুত্তলিবের বংশধর। এখানে তিনি তাঁর বংশের নাম ধরে আহ্বান করছিলেন, কারণ কুরাইশ তখনোও ইসলামে নতুন প্রবেশ করেছে, তাদেরকেই উদ্দেশ্য করে বলছিলেন, যে বংশকে নিয়ে তোমরা অহংকার করো, আমি সেই বংশেরই সন্তান।

কল্পনা করতে পারেন? আবদুল মুত্তলিবের মর্যাদাবোধ ও আত্মসম্মানের কথা, তিনিই তো দোয়া করেছিলেন আল্লাহ্ যেনো কা'বাকে রক্ষা করেন, আর আল্লাহ্ তাঁর দোয়া কবুল করে নিয়ে আবাবিল পাঠিয়েছিলেন। তিনিই জমজমকে আবার পুনঃ উন্মোচিত করেছেন। এটাই তাঁর কৃতিত্ব। আবদুল

মুত্তলিবের মতো এত মর্যাদাবান নেতা আরবের মাটিতে আর আসেনি, শুধু তিনিই নন, তাঁর পিতা, তাঁর পিতামহ ও প্রপিতামহের মতো এমন কিংবদন্তি আর হয়না, তাই এমন আবদুল মুত্তলিবের সবচেয়ে আদরের দুলাল আবদুল্লাহ এরপর তারই সন্তান মুহাম্মদ তারই কাছে আট বছর ধরে লালিত পালিত হয়েছেন। এটাই রাসূলুল্লাহ (স) এর ব্যক্তিত্ব গঠনে এক অবিস্মরণীয় অনুঘটিকা ছিলো।